সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারতত্ত্ব

একজন ভক্ত (ত্রৈলোক্যের প্রতি) -- আপনার বইয়েতে দেখলাম আপনি অবতার মানেন না। চৈতন্যদেবের কথায় দেখলাম।

ত্রৈললোক্য -- তিনি নিজেই প্রতিবাদ করেছেন, -- পুরীতে যখন অদ্বৈত ও অন্যান্য ভক্তেরা 'তিনিই ভগবান' এই বলে গান করেছিলেন, গান শুনে চৈতন্যদেব ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য। ইনি যেমন বলেন ভক্ত ঈশ্বরের বৈঠকখানা। তা বৈঠকখানা খুব সাজান বলে কি আর কিছু ঐশ্বর্য নাই?

গিরিশ -- ইনি বলেন, প্রেমই ঈশ্বরের সারাংশ -- যে মানুষ দিয়ে ঈশ্বরের প্রেম আসে তাকেই আমাদের দরকার। ইনি বলেন, গরুর দুধ বাঁট দিয়ে আসে, আমাদের বাঁটের দরকার। গরুর শরীরে অন্য কিছু দরকার নাই; হাত, পা কি শিং।

ত্রৈলোক্য -- তাঁর প্রেমদুগ্ধ অনন্ত প্রণালী দিয়ে পড়ছে! তিনি যে অনন্তশক্তি!

গিরিশ -- ওই প্রেমের কাছে আর কোন শক্তি দাঁড়ায়?

ত্রৈলোক্য -- যাঁর শক্তি তিনি মনে করলে হয়! সবই ঈশ্বরের শক্তি।

গিরিশ -- আর সব তাঁর শক্তি বটে, -- কিন্তু অবিদ্যা শক্তি।

ত্রৈলোক্য -- অবিদ্যা কি জিনিস! অবিদ্যা বলে একটা জিনিস আছে না কি? অবিদ্যা একটি অভাব। যেমন অন্ধকার আলোর অভাব। তাঁর প্রেম আমাদের পক্ষে খুব বটে। তাঁর বিন্দুতে আমাদের সিন্ধু! কিন্তু ওইটি যে শেষ, একথা বললে তাঁর সীমা করা হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও অন্যানা ভক্তদের প্রতি) -- হাঁ হাঁ, তা বটে। কিন্তু একটু মদ খেলেই আমাদের নেশা হয়। শুঁড়ির দোকানে কত মদ আছে সে হিসাবে আমাদের কাজ কি! অনন্ত শক্তির খপরে আমাদের কাজ কি?

গিরিশ (ত্রৈলোক্যের প্রতি) -- আপনি অবতার মানেন?

ত্রৈলোক্য -- ভক্ততেই ভগবান অবতীর্ণ। অনন্ত শক্তির manifestation হয় না, -- হতে পারে না! -- কোন মানুষেই হতে পারে না।

গিরিশ -- ছেলেদের 'ব্রহ্মগোপাল' বলে সেবা করতে পারেন, মহাপুরুষকে ঈশ্বর বলে কি পূজা করতে পারা যায় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি) -- অনন্ত ঢুকুতে চাও কেন? তোমাকে ছুঁলে কি তোমার সব শরীরটা ছুঁতে

হবে? যদি গঙ্গাস্নান করি তা হলে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত কি ছুঁয়ে যেতে হবে? ‘আমি গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল’। যতক্ষণ ‘আমি’ টুকু থাকে ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি। ‘আমি’ গেলে কি রইল তা কেউ জানতে পারে না, -- মুখে বলতে পারে না। যা আছে তাই আছে! তখন খানিকটা এঁতে প্রকাশ হয়েছে আর বাদবাকিটা ওখানে প্রকাশ হয়েছে, -- এ-সব মুখে বলা যায় না। সচ্চিদানন্দ সাগর! -- তার ভিতর ‘আমি’ ঘট। যতক্ষণ ঘট ততক্ষণ যেন দুভাগ জল, -- ঘটের ভিতরে একভাগ, বাহিরে এক ভাগ। ঘট ভেঙে গেলে -- এক জল -- তাও বলবার জো নাই! -- কে বলবে?

বিচারান্তে ঠাকুর ত্রৈলোক্যের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তুমি তো আনন্দে আছ?

ত্রৈলোক্য -- কই এখান থেকে উঠলেই আবার যেমন তেমনি হয়ে যাবে। এখন বেশ ঈশ্বরের উদ্দীপনা হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- জুতো পরে থাকলে, কাঁটা বনে আর তার ভয় নাই। ‘ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য’ এই বোধ থাকলে কামিনী-কাঞ্চনে আর ভয় নাই।

ত্রৈলোক্যকে মিষ্টমুখ করাইতে বলরাম কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রৈলোক্যের ও তাঁহার মতালম্বী লোকদিগের ভক্তদের নিকট বর্ণনা করিতেছেন। রাত নয়টা হইল।

[*অবতারকে কি সকলে চিনিতে পারে?*]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশ, মণি ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) -- এর আকি জানো! একটা পাতকুয়ার ব্যাঙ কখনও পৃথিবী দেখে নাই; পাতকুয়াটি জানে; তাই বিশ্বাস করবে না যে, একটা পৃথিবী আছে। ভগবানের আনন্দের সন্ধান পায় নাই, তাই ‘সংসার, সংসার’ করছে।

(গিরিশের প্রতি) -- “ওদের সঙ্গে বকচো কেন? দুইই নিয়ে অছে। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ না পেলে, সে আনন্দের কথা বুঝতে পারে না। পাঁচবছরের বালককে কি রমণসুখ বোঝানো যায়? বিষয়ীরা যে ঈশ্বর ঈশ্বর করে, সে শোনা কথা। যেমন খুড়ী জেঠিরা কোঁদল করে, তাদের কাছ থেকে বালকেরা শুনে শেখে আর বলে, ‘আমার ঈশ্বর আছেন’, ‘তোর ঈশ্বরের দিব্য।’

“তা হোক। ওদের দোষ নাই। সকলে কি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে? রামচন্দ্রকে বারজন ঋষি কেবল জানতে পেরেছিল। সকলে ধরতে পারে না। কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে; -- কেউ সাধু ভাবে; দু-চারজন অবতার বলে ধরতে পারে।

“যার যেমন পুঁজি -- জিনিসের সেইরকম দর দেয়। একজন বাবু তার চাকরকে বললে, তুই এই হীরেটি বাজারে নিয়ে যা। আমায় বলবি, কে কি-রকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা। চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়ে চেড়ে দেখে বললে -- ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি! চাকরটি বললে, ভাই আর একটু ওঠ, না হয় দশ শের দাও। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি; এতে তোমায় পোষায় তো দিয়ে যাও। চাকর তখন হাসতে হাসতে হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে বললে, মহাশয়, বেগুনওয়ালা নয় সের বেগুনের বেশি একটিও দেবে না। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি।

বাবু হেসে বললে, আচ্ছা এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা। ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদূর বুঝবে! কাপড়ওয়ালার পুঁজি একটু বেশি, -- দেখি ও কি বলে। চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বললে, ওহে এটি নেবে? কত দর দিতে পার? কাপড়ওয়ালা বললে, হাঁ জিনিসটা ভাল, এতে বেশ গয়না হতে পারে; -- তা ভাই আমি নয়শো টাকা দিতে পারি। চাকরটি বললে, ভাই আর-একটু ওঠ, তাহলে ছেড়ে দিয়ে যাই; না হয় হাজার টাকাই দাও। কাপড়ওয়ালা বললে, ভাই, আর কিছু বলো না; আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি; নয়শো টাকার বেশি একটি টাকাও আমি দিতে পারব না। চাকর ফিরিয়ে নিয়ে মনিবের কাছে হাসতে হাসতে ফিরে গেল আর বললে যে, কাপড়ওয়ালা বলেছে যে নশো টাকার বেশি একটি টাকাও সে দিতে পারবে না! আরও সে বলেছে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি। তখন তার মনিব হাসতে হাসতে বললে, এইবার জহুরীর কাছে যাও -- সে কি বলে দেখা যাক। চাকরটি জহুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই একবারে বললে, একলাখ টাকা দেব।”

[*ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি*]

“সংসারে ধর্ম ধর্ম এরা করছে। যেমন একজন ঘরে আছে, -- সব বন্ধ, -- ছাদের ফুটো দিয়ে একটু আলো আসছে। মাতার উপর ছাদ থাকলে কি সূর্যকে দেখা যায়? একটু আলো এলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চন ছাদ! ছাদ তুলে না ফেললে কি সূর্যকে দেখা যায়! সংসারী লোক যেন ঘরের ভিতর বন্দী হয়ে আছে!

“অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা ফাঁকা জায়গায় বেড়াচ্চে। তারা কখনও সংসারে বদ্ধ হয় না, -- বন্দী হয় না। তাদের ‘আমি’ মোটা ‘আমি’ নয় -- সংসারী লোকদের মতো। সংসারী লোকদের অহংকার, সংসারী লোকদের ‘আমি’ -- যেন চতুর্দিকে পাঁচিল, মাথার উপর ছাদ; -- বাহিরে কোন জিনিস দেখা যায় না। অবতারাদির ‘আমি’ পাতলা ‘আমি’। এ ‘আমি’র ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, -- পাঁচিলের দুদিকেই অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচিলের গায়ে যদি ফোকর থাকে পাঁচিলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর জলে আনাগোনাও হয়। অবতারাদির ‘আমি’ ওই ফোকরওয়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়; -- এর মানে, দেহধারণ করলেও তারা সর্বদা যোগেতেই থাকে! আবার ইচ্ছে হলে বড় ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় ফোকর হলে আনাগোনা করতে পারে; সমাধিস্থ হলেও আবার নেমে আসতে পারে।”

ভক্তেরা অবাক্‌ হইয়া অবতারতত্ত্ব শুনিতে লাগিলেন।